বাংলাদেশে চলচ্চিত্র পরিচালনায় নারী : প্রেক্ষাপট, প্রতিকূলতা ও সম্ভাবনা অনুসন্ধান

ফাহমিদা আক্তার

সার-সংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে নারী চলচ্চিত্র পরিচালকদের সংখ্যা, প্রেক্ষাপট, চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁদের প্রতিবন্ধকতা এবং তা থেকে উত্তরণের বিভিন্ন উপায় অনুসন্ধান করা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক সময়ে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের দৃঢ় প্রত্যয় দৃশ্যমান হয় সরকারি ও বেসরকারি নানা ক্ষেত্রে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে বাংলাদেশে নারীদের উন্নতিকল্পে নানা উদ্যোগ ও অব্যাহত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলেও চলচ্চিত্র পরিচালনায় এ দেশে নারীদের সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল। এই সংখ্যা যে কোনো ক্ষেত্রের তুলনায় নারীর এক প্রান্তিকায়িত অবস্থানকে নির্দেশ করে। নারীরা চলচ্চিত্রের পর্দায় উপস্থিত থাকলেও ক্যামেরার পেছনে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ পরিচালক হিসেবে তাঁদের উপস্থিতি নগণ্য। এর কারণ বহুবিধ। কারিগরি-নির্ভর এই মাধ্যমের যে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মিত ও চর্চিত হয়েছে, তাতে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ ছিল সাধারণ নারীদের প্রবেশ। নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সেই কারিগরি দক্ষতা অর্জন করলেও একজন নারী পরিচালক অনেক ক্ষেত্রেই একজন পুরুষ পরিচালকের তুলনায় নেতিবাচক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। কারণ এ দেশে এখনো নেতৃত্বের জায়গায় নারীকে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হয় নি। কারিগরি ও শৈল্পিক সক্ষমতার সমবায় যেখানে অত্যন্ত প্রয়োজন, সেই চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও রয়েছে নারীর প্রতি অনাস্থা ও তাঁকে হেয় করে দেখবার পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব। চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী ও অত্যন্ত প্রভাববিস্তারী গণমাধ্যমে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা সংযুক্ত করা আবশ্যক। চলচ্চিত্রে নারীর জীবনাভিজ্ঞতা সত্যনিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের সম্ভাবনা তৈরি হয় নারী পরিচালকের নির্মিত চলচ্চিত্রের ভেতর দিয়ে। আবার, নারী পরিচালক মাত্রই চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের শক্তিশালী রূপ নির্মাণ করবেন, সে প্রত্যাশাও সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কারণ নারীর মানস গঠন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রান্তিকায়িত ও অবদমিত। তবে, নারীর জন্য চলচ্চিত্র শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও নানা সুবিধা প্রদান তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্পবোধ ও কারিগরি জ্ঞানের বিকাশে

সহায়ক হবে। এ দেশের পর্দায় নারীর উপস্থাপন বা রিপ্রেজেন্টেশন-এর রাজনীতি নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাধর্মী লেখার অস্তিত্ব চোখে পড়লেও নারী নির্মাতার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রেক্ষাপট, প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজ অপ্রতুল। সেদিক বিবেচনায় এই প্রবন্ধ একদিকে যেমন নারী পরিচালকদের সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব, প্রেক্ষাপট ও প্রতিবন্ধকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর অনুসন্ধান করেছে, তেমনি তাঁদের কাজকে সহজতর করতে ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে এতে বিধৃত হয়েছে কিছু পরামর্শও।

ভূমিকা

বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো চলচ্চিত্র শিল্পটিও পুরুষ-অধ্যুষিত ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত। তবে কি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্প প্রায় নারীশূন্য? না, বিষয়টি তেমনও নয়। নারীরা সেখানে আছেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ক্যামেরার সামনে উপস্থিত, অভিনেত্রী হিসেবে। চলচ্চিত্র পরিচালনার মতো একটি পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং একই সাথে কারিগরি ও শৈল্পিক দক্ষতাসম্পন্ন কাজে নারীদের উপস্থিতি সত্যিই হাতেগোনা। বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুরু থেকেই, অর্থাৎ ১৯৭২ সাল থেকেই এ দেশের সংবিধানে নারী জনগোষ্ঠীর অনগ্রসরতার কারণে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সুবিধাপ্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে নানা সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে পিছিয়ে পড়া নারী জনগোষ্ঠীর সমতা বিধান ও উন্নতিকল্পে নানা বাড়তি সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও সংরক্ষিত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কখনো পরোক্ষভাবে, কখনো বা প্রত্যক্ষভাবে।[১] ১৯৭৮ সালে নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছে নারীদের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়। প্রায় সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করার শাসনতান্ত্রিক বিধান [আর্টিক্যাল ২৮(১) এবং ২৮(৩)][২] ও নারীর সমানাধিকারের অনুকূলে প্রণীত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত অব্যাহত উন্নয়ন কার্যক্রম সত্ত্বেও বাংলাদেশে চলচ্চিত্র পরিচালনায় নারী পরিচালকের সংখ্যা অতি নগণ্যই রয়ে গেছে। চলচ্চিত্রের মতো ব্যাপক প্রভাববিস্তারী মাধ্যমে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার সংযুক্তি আবশ্যক। নারী যখন চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসেন, তখন সেই চলচ্চিত্রে যে জীবন তারা নির্মাণ করেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর যাপিত জীবন উৎসারিত কিংবা তাঁর শিল্পবোধজাত হয়ে থাকে। অথচ চলচ্চিত্রে কিংবা শিল্প-সাহিত্যে আমরা যে নারীর নির্মাণ দেখি, তা অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ-নির্মিত। সুতরাং পুরুষস্রষ্টার সেই নির্মাণ যে সর্বতোভাবে

প্রকৃত নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে সম্পূর্ণ সার্থক তা বলা যাবে না। আর এ কারণেই চলচ্চিত্রে উপস্থাপন করা প্রয়োজন নারীর কণ্ঠস্বর, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা, সমস্যা-সংকট, স্বপ্ন ও জীবনবোধ। আর চলচ্চিত্রে নারীর জীবনাভিজ্ঞতা সত্যনিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের সম্ভাবনা তৈরি হয় নারী নির্মাতার নির্মিত চলচ্চিত্রের ভেতর দিয়ে। এ ছাড়াও, নারীর চলচ্চিত্র নির্মাণে সহিংসতা ও অশ্লীলতা কম চিত্রায়িত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সরকারি কিংবা বেসরকারিভাবে নারী পরিচালকদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তালিকা নির্মাণ ও তাঁদের চলচ্চিত্র নির্মাণ অভিজ্ঞতা নিয়ে সাধিত গবেষণাধর্মী লেখা তেমন একটা সম্পন্ন হয় নি। এই গবেষণা প্রবন্ধ একই সাথে নারী পরিচালকদের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁদের অবস্থান ও প্রেক্ষাপট, তাঁদের চলচ্চিত্র নির্মাণ অভিজ্ঞতা, প্রতিবন্ধকতা, প্রত্যাশাসহ তাঁদের চলচ্চিত্রের প্রবণতাসমূহ বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেছে। এ ছাড়াও, নারীবান্ধব চলচ্চিত্র নির্মাণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে করণীয় ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহের অনুসন্ধানও এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

নারী পরিচালকদের সংখ্যাতাত্ত্বিক অবস্থান

শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পে নারী পরিচালকদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এই বক্তব্যের সত্যতা নিরূপণের জন্য আবশ্যক সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্তের উপস্থাপন। নারী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সংখ্যা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, প্রথমেই অনুসন্ধান করা উচিত এ যাবৎ বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর, ১৯৭১-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ছিল ৩২৫।[৩] আশির দশকে (১৯৮০-১৯৮৯) নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ৫৬১।[৪] নব্বইয়ের দশকে এ সংখ্যা দাঁড়ায় বছরে ৮০ থেকে ১০০টি।[৫] সে হিসেবে নব্বইয়ের দশকে ছবির সংখ্যা হবার কথা প্রায় ১,০৮০টি। অনুপম হায়াৎ-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা থেকে নব্বইয়ের দশকে অর্থাৎ ১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ছবির সংখ্যা আমরা পাই ৭৫৫টি।[৬] একবিংশ শতকে, ২০০০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ৮২৮টি।[৭] বর্তমানে, মধ্যবিত্ত দর্শকদের হলবিমুখতা, সিনেমা হলের সংখ্যা আশংকাজনক হারে হ্রাস পাওয়া এবং চলচ্চিত্র খাতে লগ্নিতে পুঁজির অপ্রতুলতা, ইত্যাদি নানা কারণে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা কমেছে ব্যাপক হারে, যা বছরে প্রায় ৪১টি।[৮] ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা আমরা পাই ৫৭৯টি।[৯] এখানে প্রদত্ত বিভিন্ন দশকে চলচ্চিত্র মুক্তির হিসেব অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, ১৯৭১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছরে

বাংলাদেশে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ৩,০৪৮ (তিন হাজার আটচল্লিশটি)।[১০] আর চলচ্চিত্রের এই সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবের ভেতর নারী পরিচালকদের নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা যেমন হাতেগোনা, তেমনি তাঁদের সংখ্যাও একেবারেই নগণ্য। মূলধারার চলচ্চিত্রে নারী পরিচালকের সংখ্যা প্রায় সর্বোচ্চ বিশের কোঠায়। আর বিকল্পধারায় নারী নির্মাতার সংখ্যা বিশের কোঠা অতিক্রম করলেও তার সংখ্যা প্রায় চল্লিশ-এর ঘরেই বলা চলে।

এই প্রবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে, মূলধারা ও বিকল্পধারা– এই দুটি ভাগে ভাগ করে বাংলাদেশের নারী চলচ্চিত্র পরিচালকদের দুটি তালিকা করা হবে, যা সম্পূর্ণ বা নির্ভুল হিসেবেও দাবি করা যায় না। কারণ, নারী নির্মাতাদের নিয়ে সাধিত গবেষণাধর্মী কাজের অপ্রতুলতা যেমন রয়েছে, তেমনি নারীদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান, তাঁদের কাজের পর্যালোচনা এবং প্রচারণায়ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের অনীহা রয়েছে। নারী পরিচালকদের নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর সংরক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ আর গবেষণা পরিচালনায় চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের রয়েছে সদিচ্ছার ঘাটতি, যে কারণে নারী পরিচালকদের নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর খবর ও চলচ্চিত্র নির্মাণবিষয়ক তথ্য প্রাপ্তি অতটা সহজসাধ্য নয়। আবার কখনো নারী পরিচালকদের কাজ সংরক্ষিত হলেও বিভিন্ন সময়ে এদের নিয়ে সভা-সেমিনার, প্রদর্শনী ও সম্প্রচার আয়োজনে উদ্যোগের স্বল্পতা রয়েছে। অতএব পর্যাপ্ত গুরুত্ব না দেবার ফলে সেই চলচ্চিত্রগুলোও হারিয়ে যেতে বসেছে বিস্মৃতির অন্তরালে।

সময়ের সাথে সাথে, বাংলাদেশের নানা ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে নারীরা। শিক্ষা অর্জন, আত্মকর্মসংস্থান, প্রশাসনসহ বিভিন্ন কারিগরি-নির্ভর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, কৃষিখাতসহ পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে, যা পূর্বের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। বাংলাদেশ সরকারও ইদানিং জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করছে। নারী উন্নয়নের এই ধারা চলচ্চিত্রশিল্পে কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে আজকাল? একজন পরিচালক যেখানে চলচ্চিত্র নামক জাহাজটির নাবিকের দায়িত্ব পালন করছেন, সেখানে তাঁরা কতটা হাল ধরতে পারছেন সেই জাহাজের? নিচে উল্লিখিত দুটি সারণিতে গত ১০ বছরে (২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত) বাংলাদেশে মুক্তিপ্রাপ্ত (বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ বোর্ডের সেন্সর সনদপত্রপ্রাপ্ত) চলচ্চিত্রের সর্বমোট ও বছরভিত্তিক পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলো। সারণিদ্বয়ে একই সাথে তুলে ধরা হলো নারী ও পুরুষ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সংখ্যা ও নারী পরিচালকের হার।

সারণি ১. বাংলাদেশে ২০১১-২০২০ সাল পর্যন্ত সর্বমোট মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র (সূত্র : বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের রচয়িতা)

সাল	মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাদেশী চলচ্চিত্রের সংখ্যা	পুরুষ চলচ্চিত্র পরিচালকের সংখ্যা	নারী চলচ্চিত্র পরিচালকের সংখ্যা	নারী চলচ্চিত্র পরিচালকের হার
২০১১-২০২০	৫২৫	৫০৬	১৯	৩.৬১%

সারণি ২. বাংলাদেশে ২০১১–২০২০ সাল পর্যন্ত বছরভিত্তিক মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারী নির্মাতাদের পরিচালিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ও নারী পরিচালকদের হার (সূত্র : বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের রচয়িতা)

সাল	মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাদেশী চলচ্চিত্রের সংখ্যা	পুরুষ চলচ্চিত্র পরিচালকের সংখ্যা	নারী চলচ্চিত্র পরিচালকের সংখ্যা	নারী চলচ্চিত্র পরিচালকের হার
২০১১	৫০	৪৯	১	২%
২০১২	৫০	৪৯	১	২%
২০১৩	৭০	৬৮	২	২.৮৫%
২০১৪	৪৭	৪৭	০	০%
২০১৫	৭২	৬৮	৪	৫.৫৫%
২০১৬	৭১	৬৪	৭	৯.৮৫%
২০১৭	৫০	৪৯	১	২%
২০১৮	৫২	৫০	২	৩.৮৪%
২০১৯	৪১	৪১	০	০%
২০২০	২২	২১	১	৪.৫%

প্রথম সারণিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গত ১০ বছরে (২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত) পরিচালক হিসেবে নারীরা প্রতিনিধিত্ব করছেন সর্বমোট নির্মিত চলচ্চিত্রের মাত্র ৩.৬১%। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও নারী পরিচালকের সংখ্যা অন্যান্য পেশার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি সম্পাদিত একটি গবেষণাকর্মের পরিসংখ্যান উল্লেখ প্রয়োজন। গবেষক M. M. Lauzen সান্ডিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ের Center for the Study of Women in

Television and Film-এর অর্থায়নে ২০১৮ সালে নির্মিত বিশ্বের শীর্ষ তালিকার ২৫০টি চলচ্চিত্রের ওপর একটি বাৎসরিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই গবেষণায় আমরা দেখি বিশ্বের শীর্ষ তালিকার ২৫০ চলচ্চিত্রের মধ্যে ২০১৮ সালে, নারী পরিচালকের হার ৮%।[১১] শীর্ষ তালিকার চলচ্চিত্রসমূহে নারী পরিচালকের সংখ্যা কম হলেও তা বাংলাদেশে নির্মিত গত দশ বছরের নারী পরিচালকের হারের চেয়ে অধিক। এই গবেষণা থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, ওই একই সালে শীর্ষ ২৫০ চলচ্চিত্রে নারী চলচ্চিত্র পরিচালক, লেখক, প্রযোজক, নির্বাহী প্রযোজক, সম্পাদক ও চিত্রগ্রাহকের হার ২০%।[১২] অথচ চলচ্চিত্রের বিভিন্ন কারিগরি ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মেয়েদের অংশগ্রহণ একেবারেই আশংকাজনকভাবে কম। ২০২০ সালে, চৈতালী সমাদ্দার বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের কারিগরি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধান ও প্রাচীনতম স্টুডিও বিএফডিসি (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন) যা একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, সেখানে অদ্যাবধি একজনও নারী সম্পাদক, চিত্রগ্রাহক কিংবা শব্দগ্রাহক নেই।[১৩] বাংলাদেশের টেলিভিশন মাধ্যমে বিভিন্ন কারিগরি দিকে মেয়েদের অংশগ্রহণ ইদানিং পরিলক্ষিত হলেও চলচ্চিত্রের কেন্দ্রবিন্দু এফডিসি যে একটি প্রবল পুরুষ অধ্যুষিত ও পুরুষনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান, তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এই প্রবল পুরুষ আধিপত্যবাদী চলচ্চিত্র সংস্কৃতিতে বাংলাদেশের নারীদের অংশগ্রহণের যে হার আমরা উপরের সারণিদ্বয়ে দেখছি, তাকে পুরোপুরি হতাশাব্যঞ্জক বলা যাবে না।

উপরের পরিসংখ্যান কেবল সেন্সরশিপ বোর্ডের সেন্সর সনদপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করছে। স্বাধীন ধারার অনেক নারী পরিচালকই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেন্সরশিপ বোর্ডের সেন্সর সনদ প্রাপ্তির প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যান না। তাঁরা সাধারণত বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতিতে তাঁদের চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী করে থাকেন। সে বিবেচনায় তাঁদের সংখ্যাও অনেক। অবশ্য তাঁদের পরিসংখ্যান নির্ণয়ও কিছুটা দুরূহ সে কারণে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী তাঁদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। নিচে বাণিজ্যনির্ভর বা মূলধারার চলচ্চিত্র এবং স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্রের নারী পরিচালকদের দুটি ভাগে ভাগ করে দুটি সারণিতে উপস্থাপন করা হলো (উল্লেখ্য, এ তালিকায় কাহিনিচিত্র ও তথ্যচিত্র এই দু'ধরনের চলচ্চিত্রই তালিকাবদ্ধ হয়েছে) :

সারণি ৩. বাংলাদেশের মূলধারার নারী চলচ্চিত্র পরিচালক ও তাঁদের পরিচালিত চলচ্চিত্রের তালিকা (সূত্র : বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের রচয়িতা)

ক্রম.	পরিচালকের নাম	চলচ্চিত্রের নাম	চলচ্চিত্র মুক্তির তারিখ
১.	রেবেকা	*বিন্দু থেকে বৃত্ত*	১৯৭০
২.	জাহানার ভুঁইয়া	*সিঁদুর নিও না মুছে*	মুক্তির তারিখ অজ্ঞাত
৩.	রোজী আফসারী	*আশা নিরাশা*	১৯৮৬
৪.	সুজাতা	*অর্পণ*	১৯৮৮
৫.	কোহিনূর আক্তার সুচন্দা	*সবুজ কোট কালো চশমা*	১৯৯৯
		হাজার বছর ধরে	২০০৫
৬.	নারগিস আক্তার	*মেঘলা আকাশ*	২০০১
		চার সতীনের ঘর	২০০৫
		মেঘের কোলে রোদ	২০০৮
		অবুঝ বউ	২০১০
		পুত্র এখন পয়সাওয়ালা	২০১৩
		পৌষ মাসের পিরীত	২০১৬
		যৈবতী কন্যার মন	২০২১
৭.	আরিফা পারভিন জামান মৌসুমী	*কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি*	২০০৩
		মেহের নিগার	২০০৫

	['মেহের নিগার' গুলজার-এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত]		
৮.	কবরী সারোয়ার	*আয়না*	২০০৬
৯.	সামিয়া জামান	*রাণী কুঠির বাকি ইতিহাস*	২০০৬
		আকাশ কত দূরে	২০১৩
১০.	রুবাইয়াত হোসেন	*মেহেরজান*	২০১১
		আন্ডার কনস্ট্রাকশন	২০১৫
		মেইড ইন বাংলাদেশ	২০১৯
১১.	রওশন আরা নীপা	*মহুয়া সুন্দরী*	২০১৫
১২.	জেসমিন আক্তার নদী ['যদি তুমি জানতে' কে. এ. ফিরোজ-এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত]	*যদি তুমি জানতে*	২০১৫
		জল শ্যাওলা	২০১৭
১৩.	মেহের আফরোজ শাওন	*কৃষ্ণপক্ষ*	২০১৬
১৪.	তানিয়া আহমেদ	*ভালোবাসা এমনই হয়*	২০১৬
১৫.	মাহবুববা ইসলাম সুমী	*তুমি রবে নীরবে*	২০১৬
১৬.	মারিয়া আফরিন তুষার	*গ্রাস*	২০১৬
১৭.	মাসুমা রহমান	*চল যাই*	২০১৮
১৮.	মৃত্তিকা গুণ	*কালো মেঘের ভেলা*	২০১৮
১৯.	চয়নিকা চৌধুরী	*বিশ্ব সুন্দরী*	২০২০

সারণি ৪. বাংলাদেশের স্বাধীন ধারার নারী চলচ্চিত্র পরিচালকদের পরিচালনায় নির্মিত চলচ্চিত্র (সূত্র : বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের রচয়িতা)

ক্রম.	পরিচালকের নাম	চলচ্চিত্রের নাম	চলচ্চিত্র মুক্তির তারিখ
১.	শামীম আখতার [শামীম আখতারের সাথে 'গ্রহণকাল' তথ্যচিত্রটির সহপরিচালক ছিলেন শাহীন আখতার ও মকবুল চৌধুরী]	*গ্রহণকাল*	১৯৯৪
		ইতিহাস কন্যা	২০০০
		শিলালিপি	২০০৪
		রীনা ব্রাউন	২০১৬
২.	ইয়াসমীন কবির	*পরবাসী মন আমার*	২০০০
		স্বাধীনতা	২০০৩
		শেষকৃত্য (*দ্যা লাস্ট রাইটস*)	২০০৮
		তাজরিন	২০১৩
		রশি	২০১৬
৩.	ক্যাথরিন মাসুদ [এই চলচ্চিত্রগুলো তারেক মাসুদ-এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত।]	*মুক্তির গান*	১৯৯৬
		ভয়েসেস অব চিলড্রেন	১৯৯৭
		বাঁচতে দাও	১৯৯৮
		মুক্তির কথা	১৯৯৯
		নারীর কথা	২০০০

		অন্তর্যাত্রা	২০০৬
		নরসুন্দর	২০০৯
৪.	শবনম ফেরদৌসী	*ইন দ্যা কোয়েস্ট অব লাইফ*	২০০৪-'০৫
		ভুবন ভরা সুর	২০০৯
		দ্যা লেডি উইথ দ্যা ল্যাম্প	২০১১
		জন্মসাথী	২০১৬
		ইচ্ছা বসন্ত	২০১৬
৫.	ফারজানা রূপা	*নহ মাতা নহ কন্যা*	২০০০-'০১
৬.	ফৌজিয়া খান	*অন্য অনুভব*	১৯৯৯
		অভিযাত্রিক	২০০১
		যেতে হবে বহু দূর	২০০৪
		আমাকে বলতে দাও	২০০৫-'০৬
		গঠিত হই শূন্যে মিলাই	২০০৭
		স্টোরি উইদাউট এন এ্যান্ড	২০১২-'১৪
		যে গল্পের শেষ নেই	২০১৬
	সৈয়দা নিগার বানু	*সাজশিল্পী*	২০০৪

৭.		*টিউন সেলর*	২০১১
		মৃদুল মধুর বাঁশি	২০১৫
		ব্রিঙ্গিং হোপ	২০১৬
৮.	সামিরা হক উম্মুল খায়ের ফাতিমা	*শিখর হতে শিখরে*	২০০৪-'০৫
৯.	নাসরীন সিরাজ	*নারীর চোখে মাতৃত্ব*	২০০৪-'০৫
১০.	ফাহমিদা মুন্নী	*নিসর্গের আঁকিয়ে*	২০০৪
		সুদূরের পথিক	২০০৫
		সুরের স্বজন	২০০৫
	ফাহমিদা আক্তার [ফাহমিদা আক্তার "ফাহমিদা মুন্নী" নামে উপরের চলচ্চিত্রসমূহ পরিচালনা করেছেন। তাই একটি ক্রম "১০"-এর অধীনে ফাহমিদার চলচ্চিত্রের তালিকাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।]	*ফেরা*	২০০৮
		গড়নের গহীনে	২০০৮
১১.	রেশমী আহমেদ	*দীপান্বিতা*	২০০৪
১২.	শাহনেওয়াজ কাকলী	*উত্তরের সুর*	২০১২
	হুমায়রা বিলকিস	*নদীজান*	২০১৫

১৩.		*ম্যায়নে দিল্লি নাহি দেখা*	২০১৪
		বাগানিয়া	২০১৮
১৪.	শাহিদা আখতার	*ফাইট এসিড ভায়োলেন্স*	২০১৪
১৫.	ফারজানা ববি	*বিষকাঁটা*	২০১৫
১৬.	তাসমিয়াহ্ আফরিন মৌ	*এ টেইল অব ট্রান্সফরমেশন*	২০০৭
		কবি স্বামীর মৃত্যুর পর আমার জবানবন্দি	২০১৬
		টোকাই	২০১২
		নায়িকার এক রাত	২০১৯
১৭.	দীপা মাহবুবা ইসলাম	*লঙ্গেস্ট নাইট অব দ্যা ইয়ার*	২০১৬
		প্ল্যানচ্যাট	২০১৮
১৮.	দিলারা বেগম জলি	*জঠরলীনা*	২০১৮
১৯.	এলিজাভেথ ডি কস্টা	*বাঙলা সার্ফ গার্লস*	২০২১

বাংলাদেশের নারী চলচ্চিত্র পরিচালক : পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি, এ শিল্পে নারীর সম্পৃক্ততা মূলত তৈরি হয় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এতদঞ্চলের চলচ্চিত্র নির্মাণের পথিকৃৎ ছিলেন হীরালাল সেন। মানিকগঞ্জের এই সৃজনোন্মুখ ব্যক্তিত্ব ১৯০০ সাল থেকে ১৯১২ সালের ভেতর ১২টি ছোট ছোট কাহিনিচিত্র, ১০টি তথ্যচিত্র ও ৩টি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করেন।[১৪] তাঁর নির্মিত এই নির্বাক চলচ্চিত্র প্রচেষ্টাগুলোর একটি– 'আলী বাবা'র মর্জিনা'তে কুসুম

কুমারী নামের একজন অভিনেত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়।[১৫] কুসুম কুমারী পূর্ববঙ্গের অধিবাসিনী ছিলেন না, তা সত্ত্বেও তাঁকে প্রথম বাঙালি চলচ্চিত্রাভিনেত্রী হিসেবে আখ্যা দেওয়া চলে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর নিবাসের কারণে। অবিভক্ত বাংলায়, ঢাকায় নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র দুটি হলো : 'সুকুমারী' (১৯২৭) ও 'দি লাস্ট কিস' (১৯৩১)। নবাব পরিবারের অর্থানুকূল্য, তত্ত্বাবধান ও অংশগ্রহণে নির্মিত এই চলচ্চিত্রগুলোর প্রথমটিতে নারী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পুরুষ অভিনেতা, পরেরটিতে অর্থাৎ 'দি লাস্ট কিস' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন কয়েকজন নারী। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন পেশাদার বাইজি, অন্য দুজন অভিনেত্রী– লোলিটা ও চারুবালাকে সংগ্রহ করা হয়েছিল পতিতালয় থেকে।[১৬] মুসলমান অধ্যুষিত তৎকালীন পূর্ববঙ্গের রক্ষণশীল প্রেক্ষাপটে নাটক বা চলচ্চিত্রে নারীর অভিনয় কোনো স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। যে কারণে সাধারণ ঘরের নারীদের এ পেশায় আসার ক্ষেত্রে ছিল নানা বাধা। পরবর্তীকালে দেশভাগের পর আমরা দেখি, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নির্মিত প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬)-এ বেশ কিছু নারী অভিনেত্রীর চরিত্রাভিনয়। এঁদের মধ্যে নায়িকা পূর্ণিমা সেন-এর ছিল রঙ্গনাট্য দলে অভিনয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা। আর সহনায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ছাত্রী জহরত আরা এবং ইডেন কলেজের আইএ পড়ুয়া পিয়ারী বেগম।[১৭] পূর্ণিমা সেন, রহিমা বিবি, পিয়ারী বেগম ও জহরত আরা নামের এই অভিনেত্রীগণ তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষু এড়িয়ে সাধারণ ও শিক্ষিত পরিবার থেকে এসে চলচ্চিত্রাভিনয়ে যুক্ত হবার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন ইতিহাস।

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে 'ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন অ্যাক্ট' উত্থাপন করেন তৎকালীন বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। বিলটি পাস হয় এবং পরের বছর থেকেই ইপিএফডিসি (ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন) সক্রিয় হয়। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে নির্মিত পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার প্রথম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা চলচ্চিত্র : 'আসিয়া', 'আকাশ আর মাটি', 'মাটির পাহাড়'। 'আসিয়া' চলচ্চিত্রে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন সুমিতা দেবী। ষাটের দশকের শুরুর অনেক চলচ্চিত্রে নায়িকা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সুমিতা দেবী 'ফার্স্ট লেডি' হিসেবেও খ্যাত ছিলেন।[১৮] সুমিতা দেবী ১৯৬৬ সালে তাঁর স্বামী, পরিচালক জহির রায়হানের সহায়তায় মিতা ফিল্মস্ নামক একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং এই প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর প্রযোজিত প্রথম চলচ্চিত্র *আগুন নিয়ে খেলা* (১৯৬৬)।[১৯] এফডিসির

প্রথম ৩টি চলচ্চিত্রের একটি : 'মাটির পাহাড়'– এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন সুলতানা জামান। পরবর্তী সময়ে সুলতানা জামান চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি দুটি চলচ্চিত্র : *ভানুমতি* (১৯৬৯) ও *ছদ্মবেশী* (১৯৭০) প্রযোজনা করেন। ষাটের দশক থেকে ধীরে ধীরে চলচ্চিত্র অভিনয়ে সাধারণ পরিবারের নারীদের সংশ্লিষ্টতা বাড়তে থাকে। যদিও এ সময়েও নারীদের জন্য চলচ্চিত্র অভিনয়ে যুক্ত হওয়া ততটা সহজসাধ্য বিষয় ছিল না। এ পেশা নিয়ে তখনো ছিল নানা ধরনের সামাজিক বিধিনিষেধ ও রক্ষণশীল মনোভাব, যা একবিংশ শতকের এই আধুনিক সময়েও কম-বেশি বিরাজমান। ষাটের দশকের চলচ্চিত্রাভিনয়ে নায়িকা চরিত্রে রূপদানকৃত উল্লেখযোগ্যরা হলেন– নাসিমা, রওশন আরা, সুজাতা, শর্মিলী আহমেদ, সুচন্দা, শবনম, কবরী, শাবানা প্রমুখ।

ষাটের দশকে এহতেশাম পরিচালিত *রাজধানীর বুকে* (১৯৬০) চলচ্চিত্রে প্রথম মহিলা সংগীত পরিচালক হিসেবে ফেরদৌসী রহমান আত্মপ্রকাশ করেন। অবশ্য তিনি এখানে যৌথভাবে রবীন ঘোষের সাথে সংগীত পরিচালনা করেন। এ সময়ে প্রথম নারী কাহিনিকারেরও আত্মপ্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি। রাবেয়া খাতুন-এর লেখা গল্প নিয়ে ১৯৬৬ সালে ফজলুল হক নির্মাণ করেন *সন অব পাকিস্তান* চলচ্চিত্র। এই একই বছর, রোমেনা আফাজ নামক আরও একজন লেখিকার উপন্যাস অবলম্বনে সুভাষ দত্ত নির্মাণ করেন *কাগজের নৌকা* চলচ্চিত্র। পরবর্তী সময়ে তাঁর গল্প নিয়ে মোস্তফা মেহফুজ নির্মাণ করেন *মোমের আলো* (১৯৬৮) এবং সারথী নির্মাণ করেন *দস্যু বনহুর* (১৯৭০) চলচ্চিত্র।

উপরের আলোচনায় আমরা ষাট/সত্তর দশক পর্যন্ত চলচ্চিত্রের মোট চারটি ক্ষেত্র যথা অভিনয়, প্রযোজনা, কাহিনি রচনা ও সংগীত পরিচালনায় নারীদের উপস্থিতি দেখেছি। চলচ্চিত্র পরিচালনায় নারীর উপস্থিতির যুগান্তকারী ঘটনাটি ঘটে ১৯৭০ সালে রেবেকা পরিচালিত *বিন্দু থেকে বৃত্ত* চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে। ১৯৭০ সাল বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। পাকিস্তানি সামরিক শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এ বছরই পূর্ব পাকিস্তানে, অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশে বাঙালি নির্মাতা কর্তৃক নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে আমরা দেখি তীব্র জাতীয়তাবোধের প্রকাশ। জহির রায়হানের কালজয়ী চলচ্চিত্র *জীবন থেকে নেয়া* এ সময়ের দ্রোহ প্রকাশের এক সেলুলয়েডিক সাক্ষ্য। তেমনি এক বাঙালি নারী রেবেকা নির্মিত চলচ্চিত্র *বিন্দু থেকে বৃত্ত*-এর মুক্তি এ বছরে একটি বিস্ময়কর ঘটনাও বটে। রেবেকা চলচ্চিত্র অঙ্গনের সাথে যুক্ত হন অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। 'রাত্রি রায়' নামে তিনি প্রায় ১৪টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। অবশ্য সে সব চলচ্চিত্রে তাঁর

অভিনীত চরিত্রগুলো ছিল অপ্রধান বা পার্শ্ব চরিত্র। অভিনয়ের সূত্র ধরেই তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন চলচ্চিত্রের কারিগরি দিকের প্রতি। এক সময় সম্পাদনা ও চিত্রগ্রহণের কাজও শিখে নেন কিছুটা। তারপর চলচ্চিত্র পরিচালক-প্রযোজক ফখরুল আলমের প্রণোদনা আর উৎসাহে তিনি সাহসী হয়ে ওঠেন চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে। এরই ফলস্বরূপ আমরা ১৯৭০ সালে দেখি তাঁর *বিন্দু থেকে বৃত্ত* চলচ্চিত্রের নির্মাণ। এ সময়টি ছিল মূলত সাংস্কৃতিক নিষ্পেষণের কাল। আর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ করে চলচ্চিত্রের মতো একটি কারিগরি-নির্ভর মাধ্যমে একজন নারীর চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘটনা কত যে বাধা অতিক্রমের মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়ে উঠেছে তা সহজেই অনুমেয়। চলচ্চিত্রটি ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা লাভ করতে বা অনন্য শিল্পকুশলতার স্বাক্ষর সৃষ্টিতে সক্ষম না হলেও প্রশংসিত হয়েছিল অনেক চলচ্চিত্র সমালোচকের কাছে। এ প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে এই চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে আরো আলোচনা লভ্য।

এরপর চলচ্চিত্র নির্মাণে নারী পরিচালকদের উপস্থিতি আমরা দেখি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার প্রায় ১৫ বছর পর। স্বাধীন বাংলাদেশে নারী পরিচালকদের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে প্রশ্নটি সবার আগে চলে আসে তা হলো– কোন নারীরা এসেছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাণে? কী ছিল তাদের প্রেক্ষাপট? চলচ্চিত্র যেহেতু একটি কারিগরি মাধ্যম, তাই এই মাধ্যমে প্রবেশের ক্ষেত্রে চাই কিছু পূর্বপ্রস্তুতি। উপরন্তু, এটি প্রবলভাবে পুরুষনিয়ন্ত্রিত একটি মাধ্যম। তাই যে সকল নারী এই মাধ্যমে এসেছিলেন, তাঁদের এই মাধ্যমের সাথে সংশ্লিষ্টতা, কিংবা কাজের অভিজ্ঞতা, চলচ্চিত্র বিষয়ক জ্ঞান ও শিক্ষা ইত্যাদি থাকাটাই স্বাভাবিক। নিচে বাংলাদেশের নারী চলচ্চিত্র পরিচালকদের চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ততার প্রেক্ষাপট বা কারণসমূহ ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হলো :

সারণি ৫. বাংলাদেশের নারী পরিচালকদের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ (সূত্র : বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের রচয়িতা)

বাংলাদেশে নারী চলচ্চিত্র পরিচালকদের চলচ্চিত্র	চলচ্চিত্রাভিনয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতাসূত্রে চলচ্চিত্র নির্মাণ।
	আশির দশকে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের সাথে সম্পর্কসূত্রে চলচ্চিত্র বিষয়ক জ্ঞান লাভ ও চলচ্চিত্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হওয়া।
	নব্বই-এর দশকে বিভিন্ন এনজিওর কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টতাসূত্রে ও এনজিওর অর্থায়ন প্রাপ্ত হয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ।

নির্মাণের প্রেক্ষাপট	বিদেশ থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের ওপর বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন ও চলচ্চিত্র নির্মাণ।
	২০০০ সালের দিকে বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রযোজনা সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাসূত্রে চলচ্চিত্র নির্মাণ।
	সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অভ্যন্তরে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সূত্রে চলচ্চিত্র নির্মাণ।

স্বাধীন বাংলাদেশের নারী পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্রটি হলো রোজী আফসারী নির্মিত *আশা নিরাশা*। এর নির্মাণ বছর ১৯৮৬ সাল। রোজী আফসারী বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একজন শক্তিশালী ও সু-অভিনেত্রী। তিনি চলচ্চিত্র অভিনয়ে সংশ্লিষ্ট আছেন ষাটের দশক থেকে। বাণিজ্যিকধর্মী ও শিল্পমানসম্পন্ন চলচ্চিত্র– উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। অতএব চলচ্চিত্র অভিনয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা তাঁকে দিয়েছে এই মাধ্যম সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান, যাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর চলচ্চিত্র পরিচালনায় আসা। এ ছাড়াও তাঁর প্রথম স্বামী আব্দুস সামাদ ছিলেন একজন চলচ্চিত্র শিক্ষায় শিক্ষিত পরিচালক ও চিত্রগ্রাহক। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী মালেক আফসারীরও রয়েছে বাণিজ্যনির্ভর চলচ্চিত্রের ধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা। সুতরাং চলচ্চিত্র অভিনয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, পারিবারিকভাবে রোজী আফসারীর সুযোগ ছিল চলচ্চিত্র নির্মাণের কারিগরি দিক সম্পর্কে অবহিত হবার। রোজী আফসারীর পূর্বে একজন অভিনেত্রী জাহানার ভুঁইয়ার চলচ্চিত্র পরিচালনার বিচ্ছিন্ন কিছু তথ্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সূত্রে জানা যায়।[২০] তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রের নাম *সিঁদুর যাবে না মুছে*-র উল্লেখ সে সকল পত্র পত্রিকায় থাকলেও, জানা যায় নি এর নির্মাণ বছর সম্পর্কিত সুস্পষ্ট তথ্য। এ ছাড়াও, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের তালিকায় উল্লিখিত বছরভিত্তিক বিভিন্ন চলচ্চিত্রের নামের মধ্যেও এর সন্ধান মেলে নি।

এরপর যাঁরা চলচ্চিত্র পরিচালনায় এসেছেন তাঁদের অনেকেরই আছে একটা দীর্ঘ সময় ধরে অভিনয় পেশার সাথে সংশ্লিষ্টতার ইতিহাস। এঁদের মধ্যে সুজাতা, কবরী সারওয়ার, কোহিনুর আক্তার সুচন্দার নামোল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁরা জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে চলচ্চিত্র পরিচালনায় এসেছেন। এর আগে তাঁদের ছিল চলচ্চিত্র অভিনয়ের বেশ উজ্জ্বল অতীত। এঁরা ছাড়াও, এঁদের পরের প্রজন্মের কয়েকজন অভিনেত্রীও চলচ্চিত্র পরিচালনায় এসেছেন। এঁদের মধ্যে মৌসুমী, মেহের আফরোজ শাওন, তানিয়া আহমেদ-এর নামোল্লেখ

করা যায়। চলচ্চিত্র অভিনয়ে মৌসুমীর রয়েছে তারকা খ্যাতি, মেহের আফরোজ শাওন তাঁর প্রয়াত স্বামী হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত অনেক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন আর তানিয়া আহমেদ টেলিভিশন পর্দার পরিচিত মুখ। চলচ্চিত্র অভিনয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াও অভিনেত্রী পরিচালকদের অনেকেরই ছিল চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে এক ধরনের পারিবারিক পূর্বযোগ। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে চলচ্চিত্রে রোজী আফসারীর পারিবারিক পূর্বযোগের প্রসঙ্গ। কোহিনুর আক্তার সুচন্দার স্বামী প্রয়াত জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২) ছিলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসের একজন প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক। মেহের আফরোজ শাওনের স্বামী হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন একাধারে বাংলাদেশের জনপ্রিয় লেখক ও চলচ্চিত্র পরিচালক। তানিয়া আহমেদ-এর মামা মাসুদ পারভেজ (সোহেল রানা নামে খ্যাত) বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক। সুতরাং লক্ষণীয়, অভিনেত্রী পরিচালকদের অনেকেরই চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে এক ধরনের পারিবারিক পূর্বযোগ থাকায় তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছে এই মাধ্যম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা ও বোঝা। তাঁদের এই পূর্বযোগ অনেক ক্ষেত্রেই চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রক্রিয়া ও চলচ্চিত্রের প্রযোজক প্রাপ্তিকে সহজ করেছে।

আশির দশকে এ দেশে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের উদ্ভব বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, যা বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলন হিসেবেও খ্যাত। এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা সূত্রেও আবির্ভূত হয়েছেন অনেক নারী পরিচালক। স্বল্পদৈর্ঘ্য আন্দোলনের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে চলচ্চিত্র সংসদসমূহ। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদসমূহের কার্যক্রমের সূচনা হয় মূলত স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে ষাটের দশকে। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের চলচ্চিত্র সংসদসমূহের মধ্যে ঢাকা ফিল্ম সোসাইটি, স্টুডেন্টস ফিল্ম ক্লাব, পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ-এর নাম জানা যায়।[২১] এ সময়ে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের একজন সক্রিয় নারী কর্মী হিসেবে লায়লা সামাদ-এর সম্পৃক্ততার কথা জানা যায়।[২২] স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন যথেষ্ট গতিময়তা প্রাপ্ত হয় মধ্য সত্তর-এর দশক থেকে। অবশ্য তা ছিল শহর-কেন্দ্রিক এবং সীমাবদ্ধ ছিল মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাস্টারপিস চলচ্চিত্র প্রদর্শন, প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের ওপর আলোচনা-সমালোচনার আয়োজন, সেমিনার আয়োজন, বিভিন্ন মেয়াদি ফিল্ম অ্যাপ্রিশিয়েশন কোর্সের আয়োজন, নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে পত্রিকা প্রকাশ, ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সত্তর-আশির দশকের চলচ্চিত্র

সংসদসমূহের কাজ। বিভিন্ন সময়ে দেশী ও বিদেশি চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিভিন্ন মেয়াদি চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে থাকে চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীদের চলচ্চিত্র ভাবনা ও চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত জ্ঞান। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সতীশ বাহাদুরের পরিচালনায় আয়োজিত ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স এবং ১৯৮১ সালে আলমগীর কবিরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ কোর্স চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের নবীন কর্মীদের চলচ্চিত্র সৃজনের পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই কোর্সদ্বয়ে অংশগ্রহণ করেন শামীম আখতার, যিনি পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র পরিচালনায় এগিয়ে আসেন।[২৩] নারীবাদী চলচ্চিত্র নির্মাণে শামীম আখতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, যদিও তাঁর চলচ্চিত্র পরিচালনার শুরুটা হয় এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নে। তা সত্ত্বেও তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত জ্ঞান ও নন্দনভাবনার বিকাশে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনে তাঁর সংশ্লিষ্টতা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ফোরাম গঠিত হয় এবং এই ফোরাম কিংবা বিভিন্ন চলচ্চিত্র সংসদের সাথে সংশ্লিষ্ট নারী কর্মীরা পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে ক্যাথেরিন মাসুদ, সামিয়া জামান, শবনম ফেরদৌসী ও রেশমী আহমেদ-এর নামোল্লেখ করা যায়।

নব্বইয়ের দশকে আমরা দেখি, অনেক নারী পরিচালকের আবির্ভাব ঘটেছে এনজিও কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টতা সূত্রে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে, এনজিওর কার্যক্রম শুরু হয় মূলত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে। আশির দশক থেকে ধীরে ধীরে এনজিওসমূহ বাংলাদেশের শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, লৈঙ্গিক সমতা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে তাদের কার্যক্রম। এরই ধারাবাহিকতায় নব্বইয়ের দশক থেকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, নারী ও উন্নয়ন ইস্যুতে অনেক এনজিও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ও ফরমেটের তথ্যচিত্র ও কাহিনিচিত্র নির্মাণ। অনেক এনজিও স্থাপন করতে থাকে ভিডিওতে চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার নানা কারিগরি ইউনিট। তাদের এই চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবির্ভাব ঘটে অনেক নারী চলচ্চিত্র নির্মাতার। এঁদের মধ্যে শামীম আখতার, ইয়াসমীন কবির, ফৌজিয়া খান, শবনম ফেরদৌসী-এর নামোল্লেখ করা যায়। তবে এ সময়ে, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট নামের একটি এনজিও নতুন নারী চলচ্চিত্র নির্মাতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই প্রতিষ্ঠানটির অর্থায়নে স্বাধীন

ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতা মানজারে হাসীন মুরাদের তত্ত্বাবধান ও পরামর্শে অনেক তরুণ নারী নির্মাতা এ সময়ে নির্মাণ করেন বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র। এঁদের মধ্যে ফৌজিয়া খান, শবনম ফেরদৌসী, সৈয়দা নিগার বানু, নাসরিন সিরাজ এ্যানি, ফারজানা রূপা, লুৎফুন্নাহার মৌসুমী, সামিরা হক ও উম্মুল খায়ের ফাতেমাসহ আরও অনেকের নামোল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন এনজিওর আর্থিক সহায়তায় এই সকল নারী চলচ্চিত্র পরিচালকের নির্মিত চলচ্চিত্রে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যাসহ নারীর অধিকার বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে।

শূন্য দশকে বাংলাদেশে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সম্প্রচার গণমাধ্যমের জগতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটায়। ১৯৬৪ সালে সম্প্রচার শুরু হওয়া বিটিভি (বাংলাদেশ টেলিভিশন), যা শুরুতে পরিচিত ছিল "পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস" নামে– তা ছিল এ দেশের মানুষের নাটক, বিনোদন, খবরসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রধানতম আশ্রয়স্থল। শূন্য দশকের গোড়ায় এসে এটিএন, চ্যানেল আই ও একুশে টেলিভিশনের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও সম্প্রচার টেলিভিশন প্রযোজনার জগতেও সৃষ্টি করে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। বিশেষ করে, ২০০০ সালে সম্প্রচার শুরু করা টেরিস্টোরিয়াল চ্যানেল একুশে টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সংবাদ পরিবেশনায় সৃষ্টি করে আধুনিকতার। এরই ধারাবাহিকতায় একে একে সম্প্রচার শুরু করে বাংলা ভিশন, বৈশাখী টিভি, চ্যানেল ওয়ান, আর টিভি, দেশ টিভি, দিগন্ত ও ইসলামী টিভি।[২৪] তথ্য মন্ত্রণালয় প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে অনুমোদিত বেসরকারি টেলিভিশনের সংখ্যা ৪১টি।[২৫] বেসরকারি টেলিভিশন সম্প্রচারের এই নব তরঙ্গের ধারায় অনেক নারী টেলিভিশন প্রযোজনায় সংযুক্ত হন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধের রচয়িতাও (ফাহমিদা মুন্নী নামে) জুলাই ১৯৯৯ থেকে ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত একুশে টেলিভিশনে এবং নভেম্বর ২০০৫ থেকে জুন ২০০৬ পর্যন্ত চ্যানেল ওয়ানে ইনহাউজ টেলিভিশন প্রযোজক হিসেবে অনুষ্ঠান নির্মাণ করেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে উল্লেখ্য যে, টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রযোজনার অভিজ্ঞতা যে কাউকে দিতে পারে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাক-প্রস্তুতি। টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক নারীই এগিয়ে এসেছেন চলচ্চিত্র পরিচালনায়। এঁদের মধ্যে রওশন আরা নীপা, ফাহমিদা মুন্নী, নাসরিন সিরাজ, সৈয়দা নিগার বানু, তাসমিয়াহ্ আফরিন মৌ প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রযোজনা ছাড়াও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে অনেক নারী স্বাধীনভাবে টেলিভিশন নাটক নির্মাণ শুরু করেন এ সময়ে। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী সময়ে এগিয়ে আসেন চলচ্চিত্র নির্মাণে। এ প্রসঙ্গে চয়নিকা চৌধুরীর নামোল্লেখ করা যায়।

এক সময় হাতেগোনা এক-দুই জনের ছিল এই মাধ্যমটির ওপর প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ। সে ক্ষেত্রে, ভারতের পুনেতে অবস্থিত ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া (এফটিআইআই) বা কলকাতার সত্যজিত রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকেই ডিগ্রি নিয়ে এসেছিলেন কেউ কেউ। এঁদের মধ্যে আমরা ফৌজিয়া খান, চৈতালী সমাদ্দার-এর নামোল্লেখ করতে পারি, যাঁরা সম্পাদনায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ভারত থেকে। নার্গিস আক্তারও চলচ্চিত্র বিষয়ে কানাডার ডিএন্টরমন প্রডাকশন থেকে নির্দেশনা ও সম্পাদনায় দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, যদিও এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ মিলেছে তাঁর এনজিও সংশ্লিষ্ট কাজের সূত্রে। রুবাইয়াত হোসেনও ২০০২ সালে নিউইয়র্ক ফিল্ম একাডেমি থেকে চলচ্চিত্র পরিচালনায় সম্পন্ন করেন ডিপ্লোমা। বাংলাদেশে কিছুদিন আগ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চলচ্চিত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সেরকম সুযোগ ছিল না। অতি সম্প্রতি, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে চলচ্চিত্র বিষয়ে অধ্যয়ন ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, চলচ্চিত্র নির্মাণ কৌশল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোর্সের পাঠদানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় বিভিন্ন তত্ত্বীয় ও চলচ্চিত্রের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট কোর্সের ওপর। অবশ্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান– দুটোই চলচ্চিত্র সংক্রান্ত উচ্চ শিক্ষায় প্রয়োজন। প্রত্যাশা করি, এসব প্রতিষ্ঠানের নারী শিক্ষার্থীরা নিকট ভবিষ্যতে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে আসবেন চলচ্চিত্র নির্মাণে। এ ছাড়াও, বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১৪ সাল থেকে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানও চলচ্চিত্র নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা মেয়াদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এইসব কোর্সের পাঠদান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও বেরিয়ে আসবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী চলচ্চিত্র নির্মাতা।

উপরে বর্ণিত প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতি ছাড়াও দু-একজন চলচ্চিত্র পরিচালনায় এসেছেন চলচ্চিত্রের প্রতি গভীর টান থেকে কিংবা নারী বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে চলচ্চিত্রে রূপদানের দায়বদ্ধতা থেকে। এঁদের মধ্যে দিলারা বেগম জলির নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

নারী চলচ্চিত্র পরিচালকদের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

নারীর গল্প বলার রীতি পুরুষের চেয়ে আলাদা। হোক সে বাণিজ্য-নির্ভর চলচ্চিত্র কিংবা বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র, যে কোনো ক্ষেত্রেই নারী চলচ্চিত্রে যে গল্প বলে তা পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। ভিন্ন এই রীতির পাঠ আস্বাদনে অভ্যস্ত নয় পুরুষতন্ত্র। যুগ যুগ ধরে সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত কিংবা হালের শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্রে যে গল্প বলার ভঙ্গি ও রীতি চলে এসেছে তা পুরুষনির্মিত। দীর্ঘদিন ধরে চর্চিত ও ব্যবসায়িকভাবে সফল সে রীতি থেকে বেরিয়ে এসে নারীর গল্প বলার ধরন ও চলচ্চিত্র নির্মাণে আস্থা রাখতে পারেন না লগ্নিকারীরা। চলচ্চিত্র নির্মাণে নারী পরিচালকদের প্রধান যে সংকটের মুখোমুখি হতে হয়, তা হলো লগ্নি বা পুঁজির সংকট। তবে বাণিজ্য-নির্ভর নারী চলচ্চিত্র নির্মাতারা এ ক্ষেত্রে স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চাইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী। এঁদের অনেকেরই ছিল চলচ্চিত্র মাধ্যটির সাথে দীর্ঘ কাজের ইতিহাস। তাই চলচ্চিত্র নির্মাণের পুঁজি নিশ্চিতের ক্ষেত্রে তাঁরা এগিয়ে আছেন স্বাধীন ধারার নারী চলচ্চিত্র পরিচালকদের তুলনায়।

এ ছাড়াও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের মূল স্টুডিও এফডিসির কর্মপরিবেশ মূলধারার নারী চলচ্চিত্র পরিচালকদের কাছে পূর্বপরিচিত, কারণ এঁরা অধিকাংশই পরিচালনায় এসেছেন অভিনয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা সূত্রে। অপরদিকে স্বাধীন ধারার অনেক চলচ্চিত্র পরিচালকই হয়ত এফডিসির প্রাতিষ্ঠানিক অবয়বে কাজ করেন না। এর কারণ বিবিধ। বিকল্প ধারার পরিচালকরা প্রচলিত স্টুডিওর মেকি বাস্তবতা থেকে যেমন মুক্তি খোঁজেন, তেমনি সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এফডিসির যন্ত্রপাতি বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট কারিগরি কুশলীদের ওপর ততটা ভরসাও পান না। স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এফডিসির আধুনিকায়ন সেই মাত্রায় হয় নি। প্রতিষ্ঠানটি ক্রমেই যেন একটি লোকসানি সংস্থায় পরিণত হচ্ছে।[২৬] যে কারণে বিকল্প ধারার নারী পরিচালকরা অনেক ক্ষেত্রেই খুঁজে নেন বিকল্প নির্মাণ সহায়তা ও সেবা। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এফডিসির ভেতর ও বাহির– উভয় ক্ষেত্রেই চলচ্চিত্র নির্মাণের কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তির পরিবেশ পুরুষ নিয়ন্ত্রিত ও পুরুষ অধ্যুষিত। যাঁরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে এসেছেন, তাঁদেরও পাড়ি দিতে হয়েছে বন্ধুর পথ। সে আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়েছে পুরুষ। পুরুষ প্রাবল্য ও পুরুষ কর্তৃত্বের যে চলচ্চিত্র পরিবেশ তা শুধু বাংলাদেশেরই বাস্তবতা নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তা অত্যন্ত পুরুষ অধ্যুষিত।

নারীরা সাধারণত পুরুষ পরিচালকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বাজেটে কাজ করেন। এই দুর্বল বাজেটের কারণে তাঁদের শ্যুটিং-এ সেট-এর বিন্যাস ও লোকবল পুরুষ পরিচালকদের শ্যুটিং-এর বিন্যাসের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে। এই ভিন্নতাও হয়ত কখনো কখনো চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রী কিংবা অন্যান্য কারিগরি সহায়তাকারীদের মনে নারী পরিচালকদের প্রতি তাদের আচরণে কিছুটা প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও বাংলাদেশে বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে নারীকে যতটা সেবাদানকারী কিংবা সহায়তাকারী হিসেবে দেখা হয়, তার নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব মেনে নেবার অভ্যস্ততা ততটা তৈরি হয়নি। তাই চলচ্চিত্র পরিচালনার শুরুতে, অনেক নারী পরিচালককে কলা-কুশলী কিংবা কারিগরি সহায়ক ব্যক্তিবর্গকে পরিচালিত করতে কিছুটা বেগ পেতে হয়। এ প্রসঙ্গে পরিচালক রুবাইয়াত হোসেনের প্রথম চলচ্চিত্র *মেহেরজান* (২০১১) পরিচালনার ক্ষেত্রে এফডিসিতে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা যেতে পারে :

> আমার জন্য [এফডিসি-নির্ভর কারিগরি সহায়তায় চলচ্চিত্র নির্মাণের] অভিজ্ঞতা খুব কঠিন ছিল। কারণ তার আগে আমি বাংলাদেশে থাকিনি অনেক দিন এবং বাংলাদেশে আমাকে যখন ফিল্ম বানাতে হয় তখন এফডিসির ইউনিটের সাথে কাজ করতে হলো। ওরা হয়ত জীবনে আমার মতো পরিচালক কখনো দেখে নাই। It was hard for them to accept me. It was hard for me to work with them. It was really a nightmare! I had all sorts of actor and actresses. [...] কেউ সিনেমা, কেউ থিয়েটার আবার কেউ মডেলিং থেকে এসেছে। ওদের সবার অভিনয়কে সমপর্যায়ে আনাটা আমার জন্য খুব কঠিন একটা কাজ ছিল। প্রত্যেকেরই একটা ধারণা ছিল যে, আমি কি সিনেমা বানাতে পারব? সুতরাং আমার জন্য কাজ করাটা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। আর আমার সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন একজন পুরুষ, যিনি আমার চাইতেও বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তার সাথে আমার অনেক বোঝাপড়া করতে হতো কাজের সময়। ওই সময় থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, পরবর্তী সময়ে আমি আমার চলচ্চিত্রে সব নারী ক্রু/কারিগরি সহায়তাকারী রাখব। না হলে দেখা যায়, চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় সেটে শুধুমাত্র একজন মহিলা

> পরিচালক থাকে। যেটা খুব স্বাস্থ্যকর নয় এবং তা একটা ভারসাম্যহীন পরিবেশও বটে।[২৭]

চলচ্চিত্র পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কারিগরি দিক, যেমন চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শব্দগ্রহণ, আলোক পরিকল্পনাসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর সংশ্লিষ্টতা ও উপস্থিতি সহজসাধ্য করবে নারী পরিচালকের কাজকে। তবে নারী পরিচালকের কর্তৃত্ব মেনে না নেবার যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন রুবাইয়াত, তা কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক এই সংস্কৃতি, কখনো কখনো নারী পরিচালকের কাজকেও স্বীকৃতি দিতে নারাজ। এই প্রবণতা প্রথম থেকেই ছিল, নারী যখন চলচ্চিত্র পরিচালনায় এসেছেন। এ প্রসঙ্গে এতদঞ্চলের প্রথম নারী পরিচালক রেবেকার চলচ্চিত্র নির্মাণ নিয়ে সুধী মহল যে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন, তার উল্লেখ প্রয়োজন। ১৯৭০ সালে *দৈনিক ইত্তেফাকে* প্রকাশিত এক সমালোচনামূলক লেখায় সমালোচক চিন্ময় মুৎসুদ্দী *বিন্দু থেকে বৃত্ত*-এর পরিচালক হিসেবে রেবেকার পরিবর্তে এর প্রযোজক ফখরুল আলমকেই কৃতিত্ব দিতে চেয়েছেন :

> [...] তবুও এই ছবিতে এমন কিছু দৃশ্য আছে, এমন কিছু সংলাপ আছে যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ভালো ছবি নির্মাণের যথেষ্ট দক্ষতা ফখরুল আলমের রয়েছে। (ছবিটি রেবেকা পরিচালনা করেছেন বলে প্রচার করা হলেও আমি তাতে সন্দেহ পোষণ করছি)।[২৮]

এভাবে নারীর সৃষ্টিশীলতাকে স্বীকৃতি না দেবার প্রবণতা রয়ে গেছে আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়সহ নানা স্তরের মানুষদের মধ্যে।

নারী চলচ্চিত্র পরিচালককে কখনো কখনো শাস্তি পেতে হয়েছে প্রচলিত ডিসকোর্সকে ভাঙার দায়ে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় রুবাইয়াত হোসেনের প্রসঙ্গ। ২০১১ সালে তাঁর পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র *মেহেরজান*কে হল থেকে তুলে নিয়েছিলেন এই ছবির প্রদর্শক, মাত্র এর মুক্তির সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে। অভিযোগ ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করার, যে অভিযোগ প্রথমে এসেছে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহল থেকে। একজন নারী যখন মুক্তিযুদ্ধ বা ইতিহাসকে নতুন করে দেখেন ও দেখাতে চান চলচ্চিত্রে– সে ব্যাখ্যা মেনে নিতে কষ্ট হয় অনেকেরই। অথচ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নানা রকমের ভুল নির্মাণ (miss-representation) উপস্থাপনের নজির আছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক

চলচ্চিত্রে, যা পুরুষনির্মিত। মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক চলচ্চিত্র পরিচালকই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে নারীর ধর্ষণের শিকার হবার ঘটনাকে যৌন উত্তেজনার মোড়কে উপস্থাপন করেছেন চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে।[২৯] সেই চলচ্চিত্রগুলোকে কিন্তু এভাবে শাস্তি পেতে হয় নি, যেমন সাজার সম্মুখীন হয়েছেন রুবাইয়াত হোসেন। রুবাইয়াত বিদেশের মাটিতে *মেহেরজান*সহ অনেক চলচ্চিত্রের জন্যই প্রশংসিত হয়েছেন। একজন বাংলাদেশি নারী নির্মাতা হয়েও তাঁর দর্শক এখন বিদেশিরা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনকে লক্ষ্য রেখে চলচ্চিত্র নির্মাণ করলেও তাঁর চলচ্চিত্রের বিষয় বাংলাদেশের নানা পেশার ও শ্রেণির নারীরা।

পরিবারে নারীর নানা দায়িত্ব পালনের যে সামাজিক রীতি– তাও অনেক ক্ষেত্রে তার চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে না। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে সংসারের নানা দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সন্তান লালনপালন এবং তাঁদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় নারীকেই পালন করতে হয় সিংহভাগ দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, চলচ্চিত্র পরিচালনার মতো একটি পরিশ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ পেশায় অনেক নারী পরিচালকই নিজের সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সেভাবে সক্ষম হয়ে ওঠেন না।

চলচ্চিত্র পরিচালনায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির নারীরাই দৃশ্যমান। এখানে নেই প্রান্তিক নারী বা বিভিন্ন লঘু নৃগোষ্ঠীর নারীদের উপস্থিতি, যে কারণে চলচ্চিত্রে সেই সব নারীর জীবনের নানা দিক নির্মাণে এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়ে গেছে। তবে মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত নারী পরিচালকরা যে সব সময় তাঁদের সমাজসংশ্লিষ্ট বা জীবনঘনিষ্ঠ কাহিনি বা বিষয় নিয়েই প্রকৃত নারীর জীবন নির্মাণ করেন বা করতে পারেন চলচ্চিত্রে, তা নয়। তাঁরাও অনেক সময় প্রচলিত পুরুষতন্ত্রের ভাষাবলয়ই অনুসরণ করেন চলচ্চিত্রে। কারণ আমাদের সামাজিক প্রক্রিয়া ও বেড়ে ওঠা যে প্রচলিত ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে হয়, তা অত্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক। সেই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ ভাবনা বা জীবনকে দেখার যে চোখ তৈরি হয় নারী পরিচালকের– সেখানে প্রতিনিধিত্বশীল চলচ্চিত্র ভাষাকেই পাঠ ও পুনর্নির্মাণ করার সম্ভাবনা থেকে যায়, যদি না তার নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখা ও জানার চর্চা তৈরি হয়।

নারী চলচ্চিত্র পরিচালকের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় তাঁর চলচ্চিত্র জ্ঞান, শিল্পবোধ ও কারিগরি দিকে বিভিন্ন পরিসরের দক্ষতাও কিন্তু তাঁর এক ধরনের পুঁজি। অথচ নারী পরিচালককে গড়ে

তোলার লক্ষ্যে, আমাদের দেশে চলচ্চিত্রিক শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়া খুবই অপ্রতুল। এ ছাড়া, চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুদান বা ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সুবিধারও অপ্রতুলতা রয়েছে। সবচেয়ে বড় যে প্রতিকূলতা তা হলো দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা। এখনো চলচ্চিত্রে নারীর সম্পৃক্ততা সেভাবে সাদরে গ্রহণ করা হয় না সামাজিকভাবে। "চলচ্চিত্রের লাইনে নামা" হিসেবে আমাদের সমাজে যে মনোভঙ্গি প্রচলিত আছে, তা পেশাটির একটি গর্হিত রূপকেই যেন ইঙ্গিত দেয়। আর সে ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে, বিশেষ করে চলচ্চিত্র পরিচালনার মতো একটি নেতৃত্ব প্রদানকারী পেশায় নারীর সম্পৃক্ততা এখনো তার যথাযথ সম্মান পায় নি।

নারী পরিচালকদের প্রতিবন্ধকতা সমাধানে কিছু পরামর্শ

১. চলচ্চিত্র নির্মাণের নানা দিক যেমন চিত্রনাট্য রচনা, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শব্দ গ্রহণ, প্রযোজনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা দরকার।

২. নারী পরিচালক ও কারিগরি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারীদের নিজেদের ভেতর একতা সৃষ্টি ও নানা অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক, জোট বা সংগঠন সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

৩. দেশে ও বিদেশে নারীদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর জন্য নারী প্রদর্শক, পরিবেশক গড়ে তোলা ও নারী-নির্ভর চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করা আবশ্যক।

৪. চলচ্চিত্র অঙ্গনের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব যেমন প্রযোজক, পরিবেশক এবং সরকারের তথ্য মন্ত্রণালেয়ের অধীন বিভিন্ন শাখা, যেমন অনুদান কমিটি, বাংলাদেশে ফিল্ম আর্কাইভ, সেন্সরশিপ বোর্ডসহ নীতি নির্ধারক পর্যায়ের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সাথে নারী নির্মাতাদের নানা ব্যাপ্তির সংলাপ ও বৈঠক হওয়া প্রয়োজন।

৫. প্রতিনিধিত্বকারী ও অগ্রজ নারী পরিচালকদের সাথে নতুন নারী চলচ্চিত্র পরিচালক বা যাঁরা চলচ্চিত্র পরিচালনায় আগ্রহী তাঁদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। পৃথিবীর অনেক দেশেই এমন মেন্টরশিপ প্রোগাম চালু আছে।

৬. সরকারি অনুদান প্রাপ্তিতে নারীদের অগ্রাধিকার ও কোটা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৭. জাতীয় গণমাধ্যম বা বিটিভিতে নারীদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য বিশেষ সম্প্রচার সময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮. চলচ্চিত্রে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার সংযোজন জরুরি। কাহিনিচিত্র ও তথ্যচিত্র– উভয় শাখাতেই নারী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চলচ্চিত্র নিয়ে সরকারি ও বেসরকারিভাবে আয়োজন করা উচিত বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা, যেখানে থাকবে পুরস্কার প্রদানের সুযোগ।

৯. বিভিন্ন তৃণমূল পর্যায়ে, অর্থাৎ দরিদ্র ও লঘু নৃগোষ্ঠীর নারীদের বিশেষ সুযোগ প্রদান ও প্রশিক্ষণের আওতায় এনে চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। এতে করে তাঁরা যেমন তাঁদের জীবনের সমস্যা ও চারপাশ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হবেন, তেমনি চলচ্চিত্রে সৃষ্টি হবে নানা শ্রেণির নারী পরিচালকদের প্রতিনিধিত্ব।

১০. প্রচলিত প্রদর্শন ব্যবস্থার সাথে সাথে নতুন ওটিটি (ওভার দ্য টপ) প্ল্যাটফর্মে নারী নির্মাতাদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা দরকার। এ ক্ষেত্রে তাঁদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মূল্য সুলভ করা উচিত।

১১. পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আবশ্যক। পুরুষ পরিচালক ও কারিগরি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুরুষ কর্মীদের নানা দৈর্ঘ্যের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আওতায় আনা দরকার, যার লক্ষ্য হবে চলচ্চিত্র পরিচালনায় লিঙ্গ সমতা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।

উপসংহার

সত্যিকারভাবেই, চলচ্চিত্র মাধ্যমের সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা এবং মাধ্যমটির প্রতি তীব্র ভালোবাসা ও প্রতিশ্রুতি ছাড়া নারীর পক্ষে এই মাধ্যমে পরিচালনার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সাথে কাজ করা সম্ভব নয়। তবে চলচ্চিত্র নির্মাণের বাস্তব ক্ষেত্রটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিংবা সম্ভাবনাময় নারীর জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অতটা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। পুঁজির নিশ্চয়তা অর্থাৎ প্রযোজক প্রাপ্তি থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কলাকুশলী, যেমন অভিনেতা-অভিনেত্রী, চিত্রগ্রাহক, সম্পাদক, শব্দ ধারক, সুরকার, গীতিকার ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষ পরিচালক একই রকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যান না। নারীর নেতৃত্ব বিশেষ করে নতুন

নারী পরিচালকের নেতৃত্ব মেনে নিতে অনেক ক্ষেত্রেই কষ্ট হয় কলাকুশলীদের। পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি নারীকে ক্যামেরার সামনের উপকরণ হিসেবে দেখতে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, ততটা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি ক্যামেরার পেছনে তাঁদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে। কিন্তু সৃষ্টিশীল এই মাধ্যমেও প্রয়োজন নারীর নির্মাণ ভাবনার সংযোজন। কারণ নারীর জীবনাভিজ্ঞতা বা জীবনকে দেখার চোখ পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের চলচ্চিত্র যাত্রার শুরু থেকেই ছিল পুরুষ অধ্যুষিত ও পুরুষ পরিচালিত। এর আদ্যোপান্ত জুড়ে আছে পুরুষের শিল্পভাবনা। সুতরাং সেখানে, অর্থাৎ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পর্দাজুড়ে যে নারীর অবয়ব আমরা দেখি– তাও পুরুষের নির্মিত নারী। এ কারণেই অনেক ক্ষেত্রে, সে নারীর নির্মাণে দেখি এক আদর্শায়িত নারীর রূপকল্প, যে রূপকল্প পুরুষ নির্মাতারা কামনা করেছেন। চলচ্চিত্র মাধ্যমটি তখনই সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তা নারী ও পুরুষ উভয়ের সৃষ্টি, জীবনদর্শন ও ভাষাকে স্থান করে দেবে এর পর্দাজুড়ে ও পর্দার অন্তরালে।

ফাহমিদা আক্তার (পিএইচডি) অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। fahmida.akhter@juniv.edu

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. লিলীমা আহমেদ। 'নারী', *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১৫)। <http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80> (লিংকে প্রবেশের তারিখ : ২৯ জানুয়ারি ২০২১)।

২. বাংলাদেশের সংবিধান-এর আর্টিক্যাল ২৮(১) ও ২৮(৩)। দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-29994.html

৩. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩) পৃ. ১৮৯-১৯৪।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-২০৪।

৫. Catherine Masud. "Film policy in Bangladesh: The Road to Reform" *Forum. Daily Star,* 5(11). Nov. 2011. http://archive.thedailystar.net/forum/2011/November/film.htm (accessed on 31 January 2021).

৬. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিকথা* (ঢাকা: পলল প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ৩১৪-৩১৮।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮-৩২২।

৮. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ওয়েব পেইজ (http://www.bfcb.gov.bd/) অনুসারে ২০১৯ সালে প্রদর্শনীর জন্য সেন্সরশিপ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে মোট ৪১টি চলচ্চিত্রকে। সুতরাং এই বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ৪১। এই প্রবন্ধে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান ২০২০ সাল পর্যন্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে করোনার কারণে ২০২০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা আরও কম। তাই স্বাভাবিক সময় হিসেবে গণ্য করে এখানে ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বলা হয়েছে যে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ৪১।

৯. চলচ্চিত্রের এই পরিসংখ্যান সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে নিম্নোক্ত রচনা ও উৎস :

- অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিকথা* (ঢাকা: পলল প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ৩১৮-৩২৪।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ওয়েব পেইজে (http://www.bfcb.gov.bd/) উল্লিখিত বিভিন্ন বছরে সেন্সর সনদপত্র প্রাপ্ত চলচ্চিত্রের তালিকা।

১০. এ হিসেব যে সম্পূর্ণ নির্ভুল, সে দাবি করা যাবে না। সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে চলচ্চিত্রের সঠিক ও সর্বমোট হিসেব নির্ণয়ে সুস্পষ্ট উদ্যোগ চোখে পড়ে নি। তবে এ হিসেব বাস্তব সংখ্যার কাছাকাছি।

১১. M. M. Lauzen. "The celluloid ceiling: Behind-the-scenes employment of women on the top 100, 250, and 500 films of 2018". Center for the Study of Women in Television and Film, (San Diego State University, 2018). p. 1.

১২. Ibid, p.1.

১৩. Chaitali Somadder, A keynote paper entitled "Bangladeshi Women's Contribution in the Technical Field of Cinema" presented at the '6th International Conference on Women in Cinema', part of the 18th Dhaka International Film Festival, 2020, organized by Rainbow Film Festival.

১৪. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিকথা* (ঢাকা: পলল প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ২১।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১৬. মির্জা তারেকুল কাদের। *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৭৪, ৭৫।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

১৮. "রূপালী পর্দার সোনালী যুগের সেই নায়িকারা", *পূর্ব-পশ্চিম*, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, অনলাইন লিংক : https://www.ppbd.news/selected/35969/ (লিংকে প্রবেশের তারিখ : ১২ মে ২০২১)

১৯. অব্যয় রহমান। সুমিতা দেবী। (ঢাকা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১১), পৃ. ৬২।

২০. রাহাত সাইফুল, "চলচ্চিত্রের নারীরা ফিরে আসুক সম্মানের আসনে।" *রাইজিং বিডি.কম*, ৮ মার্চ ২০১৭, অনলাইন লিংক : <https://www.risingbd.com/opinion/news/216792> (লিংকে প্রবেশের তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এবং আহমেদ জামান শিমুল, "নারী পরিচালকের সংখ্যা নগণ্য", *sharabangla.net*, ৮ মার্চ ২০২১, অনলাইন লিংক : <https://sarabangla.net/post/sb-527259/> (লিংকে প্রবেশের তারিখ : ১২ এপ্রিল ২০২১)।

২১. মো. ইশতিয়াকুর রহমান ভুইয়া। "বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ৫০ বছর (১৯৬১-২০১৩)" অনলাইন লিংক : https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/abboybd/30253211 (লিংকে প্রবেশের তারিখ : ১১ মে ২০২১)।

২২. প্রাগুক্ত।

২৩. অত্র প্রবন্ধ রচয়িতার সাথে পরিচালক শামীম আখতার-এর সাক্ষাৎকার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সাল ২০০০।

২৪. অমিত গোস্বামী। "বাংলাদেশের টেলিভিশন শিল্পের ইতিহাস ও ভারতে প্রবেশ", *ডেইলি বাংলাদেশ*। ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯। অনলাইন লিংক : https://www.daily-bangladesh.com/opinion/133651 (লিংকে প্রবেশের তারিখ : ১১ এপ্রিল ২০২১)।

২৫. প্রাগুক্ত।

২৬. "রুগ্ন এফডিসিকে বাঁচাতে কর্মপরিকল্পনা", *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩০ জুন ২০১৯। অনলাইন লিংক : https://www.dailyinqilab.com/article/216640 (লিংকে প্রবেশের তারিখ : ১৫ এপ্রিল ২০২১)।

২৭. জুম প্ল্যাটফর্মে রুবাইয়াত হোসেনের সাথে অত্র প্রবন্ধ রচয়িতার সাক্ষাৎকার-এর অংশবিশেষ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের বছর : ২০২১। সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ কিছুটা পরিমার্জিত রূপে লেখা।

২৮. চিন্ময় মুৎসুদ্দী। "বাস্তবধর্মী কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত দর্শনীয় ছবি *বিন্দু থেকে বৃত্ত*", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ ১৯৭০, পৃ. ৬।

২৯. আলমগীর কবির, "মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের চলচ্চিত্র", *স্মরণিকা*, আজিজ মেহের, রফিকুজ্জামান ও বাবলু ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি-মার্চ (ঢাকা: বাংলাদেশ সৎ চলচ্চিত্র ফ্রন্ট, ১৯৮৯) পৃ. ৪১।